# টার্নিং-পয়েন্ট

ছন্দা চট্টোপাধ্যায়

পুনশ্চ

# ভূমিকা

কথায় বলে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে। এখানে বিধাতার ভূমিকায় আসলে সময়। অস্বীকার করার জায়গা নেই এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার চাবিকাঠি সময়ের হাতে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক না কেন, জন্ম এবং মৃত্যুর মুহূর্ত আজো রহস্যাবৃত। ঠিক তেমনই বিয়ে। হাজার পরিকল্পনা করেও বিয়ে ভেস্তে গেছে এমন ঘটনা বিরল নয়, আবার কোনোরকম পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি ছাড়াই বিয়ে হয়ে গেছে, এমন ঘটনাও কম নয়। একটা বিয়ে জীবনের বাকি দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করে—এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। 'বিয়ে' কি জীবনের টার্নিং-পয়েন্ট! এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন লেখক তাঁর এই উপন্যাসে।

আজ একটা বিতর্কসভায় বিচারক হয়ে গেছিলাম। বিতর্কের বিষয় ছিল 'বিবাহ জীবনের একটা বড়ো টার্নিং পয়েন্ট'। বেশ জমে উঠেছিল বিতর্কসভা। মজার ব্যাপার হলো যারা বিষয়ের পক্ষে বক্তব্য রাখল তাদের বয়স কুড়ি থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। বিষয়ের বিপক্ষের বক্তাদের বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে। উভয়পক্ষে দশজন বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছিল। প্রাপ্ত পয়েন্ট-এর বিচারে জয়ী হল বিষয়ের পক্ষের বক্তারা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম এরকম বিতর্কসভার প্রয়োজন আছে। আমাদের ছাত্রজীবনে বিতর্ক প্রতিযোগিতা তাৎক্ষণিক বক্তৃতা—এসবের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এখন এসব প্রায় উধাও। বুদ্ধির গোড়ায় শান দিতে বিতর্ক প্রতিযোগিতার তুলনা নেই।

বিবাহ যে টার্নিং পয়েন্ট সে ব্যাপারে আমার নিজের কোনো সন্দেহ নেই। পরপর অনেকগুলো মুখ ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠল। পদ্মা, রুমিদি, অতনু....

ভালো করে জ্ঞান হবার আগে থেকেই আমার প্রিয় বন্ধু ছিল পদ্মা। তখন বন্ধুর মানে বুঝতাম না। এটুকু মনে আছে ওর সঙ্গে খেলা করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকতাম! যত বড়ো হলাম, ততই আরো বেশি করে অনুভব করলাম ওর সঙ্গে দেখা না হলে মনখারাপ করে অথচ একসঙ্গে স্কুলে যাওয়া-

আসা ক্লাসে পাশাপাশি বসা। তবু স্কুল থেকে ফিরে মুখহাত ধুয়ে খাবার খেয়ে ছুট লাগাতাম খেলার মাঠের দিকে। সেখানে পদ্মার সঙ্গে দেখা হবে। যত উঁচু ক্লাস হল, খেলার মাঠের পর্বটা ধীরে ধীরে কমে গেল। তার একটা বড়ো কারণ—আমরা একটা বর্ধিষ্ণু গ্রামে বসবাস করেছি। যেখানে কিশোরীবয়স শেষ হবার আগেই হুলিয়া জারি হয়ে যেত—ঘরের বাইরে বেরনো চলবে না। ক্লাস এইটে ওঠার পরে তাই আমাদের বিকেলের 'সেশন' চলত হয় পদ্মাদের বাড়ির ছাদে, কিংবা আমাদের বাড়ির ছাদে।

বাইরে বেরনোর নিষেধের কারণটাও ধীরেধীরে বুঝতে পারলাম। আমাদের চেয়ে কিছু বড়ো ছেলেদের একটা দল যে আমাদের প্রতি বিশেষ আগ্রহী হয় উঠেছে সেটা বুঝতে পারছিলাম। স্কুলে যাবার পথে মোড়ের মাথায় তারা হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকত। আবার স্কুল ছুটির পরে সেখানেই একভাবে দাঁড়িয়ে থাকত। যে বাড়ির ছাদেই থাকি না কেন, আট-দশবার চক্কর দিয়ে জানান দিত তাদের দরদী অস্তিত্ব। আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম এইতো কদিন আগে এরা দাদাগিরি করে বিরক্ত করত। হঠাৎ তারা প্রেমিক হবার চেষ্টা করছে কেন! সবাই তো চেনা-জানা। একই গ্রমের ছেলেমেয়ে। যাই হোক আমরা ঠিক করে নিলাম ওদের বেপাত্তা করতে হবে।

পদ্মাদের বড়ো-সড়ো জয়েন্ট-ফ্যামিলিল। কাকুরা তিনভাই মিলে পৈতৃক পাইকারি নটকোনা ব্যবসা চালাত। গ্রামের

মুষ্টিমেয় পাকাবাড়ির মধ্যে একটা ছিল পদ্মাদের বিশাল তিনতলা পাকাবাড়ি। বাড়ির পিছনদিকে গোয়ালবাড়ি পেরিয়ে আমবাগান-ঘেরা বড়ো পুকুর। আমরা একটা দু-কামরার ভাড়াবাড়িতে থাকতাম। তাই হয়তো সেইসময় ওদের খুব বড়োলোক মনে হত, আর দেখার মত ছিল পদ্মার আদর। পুরো পরিবারের ও ছিল দশ ভাইয়ের একটা বোন বা দিদি। সবার নয়নের মনি। আমার মোটেই হিংসা হত না। ওর জন্যে ওদের বাড়িতে আমারো খুব খাতির ছিল। ছাদে আমরা দুই বন্ধু আড্ডা দিচ্ছি বা পড়াশুনো করছি, ওদের বাড়ির কাজের লোক ভুবনকাকা আমাদের দুজনের জন্য কাঁসার বাটিতে গরম দুধ এনে বলত—সবটা শেষ করতে হবে। বাড়ির খাঁটি গরুর দুধ—দারুণ লাগত খেতে। এখনো যেন সেই স্বাদ মুখে লেগে আছে।

পদ্মা লেখাপড়ায় একটু কমজোরী চিল। প্রমোশন পেত ঠিকই, তবে দু-একটা লাল দাগ থেকেই যেত। ক্লাস টেনে ওঠার পরে আমার নিজের মধ্যে কেমন একটা দায়িত্ববোধ চলে এল—পদ্মাকে ভালোভাবে পাশ করাতেই হবে। আমি বন্ধু থেকে মাঝেমাঝেই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে লাগলাম। খুশির ব্যাপার হল—টেস্টেও পদ্মা সব সাবজেক্টে পাশ করে ফাইনাল পরীক্ষায় বসার লাইসেন্স পেয়ে গেল। মার্চে ফাইনাল। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি প্রিপারেশন লীভ। স্কুলে দেখা না হলেও বাড়িতে দেখা হত। ওকে পড়ানোর কিছু দায়ভারও আমার ছিল। একদিন বিকেলে ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখি সবার

থমথমে মুখ। পদ্মার মা আমাকে বলল, শোন তোকে একটা কথা বলার আছে। একটা ভালো বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে পদ্মার। ছেলেদের ওষুধের বড়ো দোকান আছে বর্ধমান শহরে। দুই ভাই। ওরা দু-একদিনের মধ্যে দেখতে আসবে। পদ্মা বেঁকে বসেছে। কিছুতেই বিয়ে করবে না এখন। ওদিকে তোর কাকু কথা দিয়ে দিয়েছে। তুই ওর এত বন্ধু, তোর কথা ফেলতে পারবে না।

আমার চোখের সামনেটা যেন মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার হয়ে গেল। তারপরে সামলে নিয়ে বললাম, তোমরা এখন ওর বিয়ে দেবে কেন কাকিমা! সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। পরীক্ষার পরে মেয়ে দেখানোর ব্যবস্থা করো। কাকিমা বলল, ওরা অতদিন অপেক্ষা করবে কেন মেয়ে দেখার জন্যে! মেয়ে দেখলেই যে পছন্দ হয়ে যাবে তার কোনো মানে নেই। আর যদি পছন্দ হয়ে যায়, তখন বলা যাবে—বিয়ের তারিখ পরীক্ষা শেষ হবার পরে করতে হবে। যা না মা একটু বুঝিয়ে বল। সকাল থেকে রাগ করে কিছুই খায়নি মেয়েটা।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ছাদে চলে গেলাম। মুখ-চোখ লাল করে ফেলেছে পদ্মা কেঁদেকেঁদে। আমকে দেখে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। আমি কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, কাঁদছিস কেন বোকা! কাকিমার সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল মেয়ে দেখানো ব্যাপারটা আটকানো যাবে না। তুই এক কাজ কর। মেয়ে দেখে যাক না। শুধু মেয়ে পছন্দ হলে তো চলবে না। মেয়ের তো ছেলেকেও পছন্দ হতে হবে। ওদের

যদি পছন্দ হয়, তুই পরিষ্কার জানিয়ে দিবি—তোর ছেলে পছন্দ হয়নি! ব্যস মিটে গেল! নে এবার একটু হাস বাবা। আর বই-খাতাগুলো বের কর।

পদ্মা বলল, আমাদের বাড়িকে তুই চিনিস না। আমার পছন্দ অপছন্দকে পাত্তা দেবে ভেবেছিস!

বললাম, সেটা তোকে লড়াই করে আদায় করতে হবে পদ্মা। তাছাড়া তুই বোঝাবি তুই গ্রাজুয়েশন করার আগে কিছুতেই বিয়ে করবি না। নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে হবে বুঝলি!

—কে শুনবে আমার কথা! পড়াশুনোয় তত ভালোও তো নয় যে জোর করে কিছু বলব।

—চেষ্টা করলেই তুই ঠিক বিএ পাশ করে ফেলবি। কিন্তু পড়ার সুযোগটা তো পেতে হবে। ওইসব ফালতু কথায় মন না দিয়ে ভালো করে পড়াশুনো করে হায়ারসেকেন্ডারিতে ভালো রেজাল্ট কর। তারপরে দেখা যাবে তোর বি এ পড়া কে আটকায়।

তিনদিনের মাথায় এক রবিবারের বিকেলে পাত্রপক্ষ দেখতে এল পদ্মাকে। কি হলো জানার জন্যে আমার তর সইছিল না। বিকেল না হতেই পৌঁছে গেলাম ওদের বাড়িতে। তখনও বাড়িতে বেশ হৈ-হট্টগোল চলছে। বেশ খুশির পরিবেশ। আমাকে দেখে একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে এল কাকিমা, তোর বন্ধুর মতি ফিরেছে রে। আজকেই জানিয়ে গেল ওরা—মেয়ে পছন্দ হয়েছে। শুভদিন দেখে দিনক্ষণ ঠিক করতে যাবে তোর